(B) ধ্রুপদী যুগ (Classical Age) [1800-1859 AD]

আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ড এবং কার্ল রিটার-এর অবদান ভূগোলে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এদের একত্রে "আধুনিক ভূগোলের জনক" (Father of Modern Geography) আখ্যা দেওয়া হয়। প্রায় একই সময়ে এই দুজন জার্মানির বার্লিন শহরে ভূগোলের পঠনপাঠন ও গবেষণা করেন। ভূগোল পঠনপাঠন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে যে অবদান তাঁরা রেখে গেছেন সেগুলিকে একত্রে **ভূগোল শাস্ত্রের মুল কাঠামো** হিসেবে ধরা হয়। ওই কাঠামোর ওপরে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভৌগোলিকেরা নতুন নতুন রূপরেখা তৈরি করেন। একটি স্বতন্ত্র পাঠ্যবিষয় তথা বিজ্ঞান হিসেবে ভূগোল এই সময়ে এঁদের দুজনের অবদানে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই এই সময়কে ভূগোলের সৃষ্টির ইতিহাসে **ধ্রুপদী অধ্যায়** হিসেবে গণ্য করা হয়। এবার এই দুই ভৌগোলিকের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ড (Alexander Von Humboldt) (1769-1859)

1769 সালে বার্লিনের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হামবোল্ড জার্মানির গটিনজেন (Gottingen) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, খনিজ-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও খনিজ উত্তোলন সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। 1792 সালে প্রুসিয়াতে (Prussia) তিনি ডিরেক্টর অফ মাইনস' (Director of Mines) পদে আসীন হন। 1797 সালে তিনি সরকারী চাকরিতে পদত্যাগ করে

Scanned with CamScanner

ভূগোলের গবেষণার জন্য বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ভৌগোলিক জ্ঞান আহরণের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত করেন।

ভূগোলে হামবোল্ডের অবদান :

A. ভ্রমণ : প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ (Travel– Direct observation for data collection) : হামবোল্ডই প্রথম ভৌগোলিক যিনি পাহাড়, পর্বত, নদী ইত্যাদি এলাকায় ভ্রমণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা জ্ঞান আহরণের পদ্ধতির প্রচলন করেন। তিনি আল্পস পর্বতের শিলাগঠনের ওপর গভীরভাবে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড ও ইতালির বৃহদাংশ ভ্রমণ করেন। তিনি ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা এবং পশ্চিমে মেক্সিকো, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে পূর্বে সাইবেরিয়া (রাশিয়া) পর্যন্ত বিস্তীর্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা তাঁকে একস্থানে বন্ধ রাখেনি। তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার মাইল ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গভীর নিরীক্ষণ ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার নজির রেখেছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষার (Field Survey) দ্বারা ভৌগোলিক পঠনপাঠনের যে পদ্ধতি তিনি প্রচলন করেন তা আজও ভূগোলের ছাত্রছাত্রী এবং গবেষক-গবেষিকারা আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসরণ করে। এভাবেই ভূগোল একটি **ক্ষেত্র সমীক্ষার বিজ্ঞানে** পরিণত হয় (Geography is a science of field observation)।

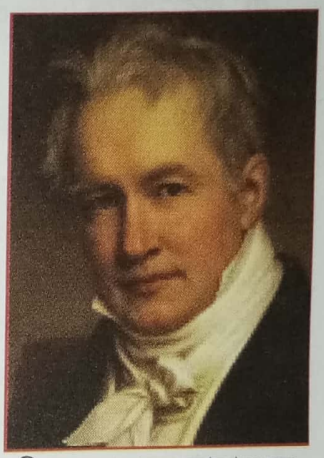

চিত্র 5.3 : আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ড (1769-1859)

B. ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Instructments for collection of Geographic Information) : ভ্রমণের সময় প্রায় চল্লিশ ধরনের যন্ত্রপাতি তিনি ব্যবহার করেন যেগুলির মাধ্যমে ভূমিরূপ, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের পরিমাপ করা হয়। সেক্টট্যান্ট, ব্যারোমিটার, টেলিস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়, বায়ুর চাপ পরিমাপ ইত্যাদির দ্বারা সঠিক তথ্য সংগ্রহের আয়োজন করেন এবং এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ভূগোল শাস্ত্রকে প্রকৃত বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বস্তুগত পরিমাপের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ জরুরি, এই পদ্ধতিটি হামবোল্ড প্রচলন করেছিলেন, আজ থেকে প্রায় 300 বছর আগে। এখনো ছাত্রছাত্রীরা জরিপের জন্য কম্পাস, লেভেলিং, থিওডোলাইট, জি. পি. এস (GPS), টোটাল স্টেশন (Total Station) প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপ করে বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহের দ্বারা মানচিত্র তৈরি করে।

C. ভৌগোলিক পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি (Approaches for Geographical Study) : ভৌগোলিক পঠনপাঠনের জন্য ভ্রমণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ পর্যালোচনার দ্বারা তথ্য সংগ্রহ এবং এই সংগৃহীত তথ্য থেকে জ্ঞান আহরণ এবং ক্রমে ওই জ্ঞানের সংশ্লেষের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এই **আরোহী** (inductive) **পদ্ধতিতে** ভৌগোলিক পর্যালোচনার কথা হামবোল্ড বলেন। এই মতবাদ প্রচলিত কান্টের **অবরোহী পদ্ধতির** বিপরীত। ভৌগোলিক পঠনপাঠন ও গবেষণার রূপরেখা হামবোল্ড প্রথম তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন।

D. জ্ঞানের সামগ্রিক পরিসরের মধ্যে পার্থিব বিজ্ঞান হিসেবে ভূগোলের অবস্থান (Place of Geography as earth science in the domain of knowledge) : কান্টের অনুসরণে হামবোল্ড জ্ঞানের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করেন—

(i) **প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞান (Systematic Science)** : এখানে বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর বৈশিষ্ট্যের বিচারে পঠনপাঠন হয়, যথা— উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি।

(ii) **ঐতিহাসিক বিজ্ঞান (Historical Science)** : বিভিন্ন বিষয়ের সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা, অর্থাৎ ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বিষয় প্রভৃতি।

(iii) **পার্থিব বিজ্ঞান (Earth Science)** : পৃথিবীপৃষ্ঠ বিষয়ক ঘটনাবলীর বণ্টন বা সজ্জা পর্যালোচনা, অর্থাৎ ভূগোল।

Scanned with CamScanner

হামবোল্ড ভূগোলে পার্থিব প্রণালীর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত বা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (holistic approach) ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, পৃথিবী একটি জৈব সামগ্রিক একক (a organic whole) যার প্রতিটি অংশ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এইভাবে সামগ্রিক জ্ঞানের পরিসরে ভূগোলের অবস্থান এবং ভৌগোলিকের দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি 'কসমোগ্রাফি' (Cosmography) বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের ধারণা দেন। এই কসমোগ্রাফিকে তিনি আবার দুভাগে ভাগ করেন। যেমন—

(i) উরানোগ্রাফি (Uranography) বা অ্যাস্ট্রোনমি বা জ্যোতির্বিদ্যা যা গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয়ে আলোচনা করে।

(ii) জিওগ্রাফি (Geography) বা ভূগোল যা পৃথিবীর সম্পর্কে আলোচনা করে।

E. ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ (Data analysis) : হামবোল্ড ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের ব্যবহারের মাধ্যমে মানচিত্র তৈরি করেন। তিনি 10° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী এলাকার উচ্চতার বন্টন বা ভূপ্রকৃতির মানচিত্র প্রস্তুত করেন। বিভিন্ন সময়ে প্রস্তুত মানচিত্রের সময়ভিত্তিক তুলনামূলক পরিবর্তনের পরিমাপের (Change detection) ধারণা দেন। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, শস্য, হিমরেখা প্রভৃতির পরিবর্তনের পর্যালোচনার এক অভিনব পদ্ধতি প্রচলন করেন। তাঁর মতে, ক্ষেত্রসমীক্ষা দ্বারা কেবল কিছু তথ্য সংগৃহীত হয় তাই নয়, সেই তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো ভৌগোলিক বিষয়ের স্থানভিত্তিক বন্টন বৈষম্য এবং বিভিন্ন এলাকায় ভৌগোলিক বিষয়সমূহের মধ্যে আন্তসম্পর্ক বোঝা সম্ভব। এভাবে ভূগোলের পঠনপাঠনের এবং পর্যালোচনার একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতি শুরু হয়।

F. প্রণালীবদ্ধ ও আঞ্চলিক বিশ্লেষণ : হামবোল্ড, সংগৃহীত তথ্যের পৃথিবীব্যাপী বন্টন পর্যালোচনার দ্বারা সাধারণীকরণের প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণের পাশাপাশি আঞ্চলিক বিশ্লেষণকেও গুরুত্ব দেন। এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি সামগ্রিক একক রূপে একটি অঞ্চলকে পর্যালোচনার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। এর ফলে মানুষ ও প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এক-একটি স্বতন্ত্র ভূদৃশ্য এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়। তাঁর মতে, রাশিয়ার স্টেপ, ক্রান্তীয় সাভানা, আমেরিকার প্রেইরি, তুন্দ্রা তৃণভূমি স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর পাশাপাশি এই এলাকাগুলির মধ্যেও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের সন্ধান করা উচিত যার দ্বারা **সাধারণ তত্ত্ব বা মডেল** তৈরি করা যায়। হামবোল্ড এভাবেই প্রণালীবদ্ধ এবং আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন।

G. কসমস— ক্রমবিন্যস্ত পৃথিবী (Cosmos –the Ordered World) : 1845-1862 সালের মধ্যে 5টি খণ্ডে হামবোল্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ **'কসমস' (Cosmos) প্রকাশিত হয়**। তাঁর সমগ্র জীবনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণের দ্বারা সংশ্লেষের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন সেগুলিকে সার্থকভাবে লিপিবদ্ধ করেন তাঁর এই গ্রন্থে। মূলত আরোহী পদ্ধতিতে এই জ্ঞানের সংশ্লেষ করা হয়েছিল। একাধারে প্রণালীবদ্ধ বন্টন এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বর্ণনা— দুটি বিষয়ই তাঁর এই গ্রন্থে সমান গুরুত্ব পেয়েছিল।

সংক্ষেপে ভূগোলে হামবোল্ডের অবদান ঃ

(i) ভ্রমণের দ্বারা প্রত্যক্ষ সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির প্রচলন এবং ভূগোল শাস্ত্রকে ক্ষেত্রসমীক্ষার বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

(ii) ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিমাপ, যা ভূগোলকে প্রকৃত বিজ্ঞান হিসেবে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা দেয়।

(iii) জরিপ বা সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা মানচিত্র তৈরির প্রচলন। এই মানচিত্রগুলির তুলনার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক বিষয়ের পরিবর্তন ব্যাখ্যা।

Scanned with CamScanner

(iv) সংগৃহীত তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পৃথিবীব্যাপী বন্টন ব্যাখ্যা বা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির প্রচলন।

(v) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা সমীক্ষার দ্বারা সংগৃহীত তথ্য থেকে ক্রমে আরোহী পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ বা সিদ্ধান্তে আরোহণ – এভাবে ভূগোলের গবেষণা পদ্ধতি স্থির করা।

(vi) ভূগোল শাস্ত্রকে পার্থিব বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

(vii) 'কসমস' ('Cosmos') গ্রন্থের মাধ্যমে কীভাবে ভ্রমণ বা প্রত্যক্ষ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা জ্ঞানকে সংগঠিত ভাবে উপস্থাপন করা যায় তার সার্থক উদাহরণ প্রদান।

কার্ল রিটার (Carl Ritter) (1779-1859)

চিত্র 5.4 : কার্ল রিটার (1779-1859)

1779 সালে কার্ল রিটার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, খনিজ বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করেন। তিনি প্রথমে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক পদে তিনি আমৃত্যু আসীন ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছরের অধ্যাপনার এবং আরও দীর্ঘ সময়ের পঠনপাঠনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি ভূগোল বিষয়কে সমৃদ্ধ করেন - যার মাধ্যমে ভৌগোলিক পঠনপাঠনের একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং এই কারণে কার্ল রিটারকে **ভূগোলের জনক** (Father of Geography) বলা হয়।

ভূগোল শাস্ত্রে কার্ল রিটারের অবদান :

(i) ভূগোলকে 'মানুষের বাসস্থানরূপী পৃথিবীর' পর্যালোচনার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা : কার্ল রিটার ভৌগোলিক আলোচনায় মানবিক বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, ভূগোল হল পৃথিবীর বিজ্ঞান যে পৃথিবীকে মানুষের বাসস্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবে রিটার ভূগোলের পঠনপাঠন ও গবেষণাকে 'মানুষ' কেন্দ্রিক করে তোলেন। তাঁর মতে, মানুষের শরীর যেভাবে আত্মা বা জীবনকে ধারণের জন্য তৈরি, ঠিক সেভাবে পার্থিব ভৌত-পৃথিবীও মানুষের জন্য তৈরি।

(ii) ভূগোলে আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা : রিটার পৃথিবীকে বিভিন্ন ক্রমের অঞ্চলে ভাগ করে, এক-একটি অঞ্চলের ভিত্তিতে ভৌগোলিক বিষয়সমূহের বর্ণনার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ক্রম (hierarchy of region) ঃ

(a) প্রথম ক্রম (বৃহত্তম) – পৃথিবী (Erd Kunde),
(b) দ্বিতীয় ক্রম – মহাদেশীয় একক (Erdtiele),
(c) তৃতীয় ক্রম – ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী এক-একটি মহাদেশের অংশ বিশেষ,
(d) চতুর্থ ক্রম – স্থানীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতম আঞ্চলিক একক।

এক-একটি এলাকায় মানুষ এবং প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংশ্লেষের (Synthesis) মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল রিটারের উদ্দেশ্য। এর থেকেই পরবর্তীকালে **আঞ্চলিক পৃথকীকরণ** (Regional differentiation) ধারণার উদ্ভব হয়। রিটার এভাবে আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াকে ছোটো ছোটো অঞ্চলে ভাগ করেন ও তাঁদের বিস্তৃত বিবরণ দেন। এই সংশ্লেষের জন্য তিনি তিন ধরনের ভৌগোলিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিরূপণের উল্লেখ করেন।

(a) *ভূপ্রকৃতিগত (Topographical) বিষয়সমূহ* অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ, যথা— ভূমিরূপ প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

(b) *আকৃতিগত (Formal) বিষয়সমূহ* যা এলাকার প্রণালীগত বা সাধারণ গুনাবলীকে নির্দেশ করে, যেমন— বায়ুমণ্ডল, নদনদী প্রভৃতি।

(c) *বস্তুগত বিষয়সমূহ (Material)* অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ইতিহাসের ভৌগোলিক বিবরণ যা জনসংখ্যার বণ্টন, খনিজের অবস্থান, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বণ্টন ও তার পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

(iii) আঞ্চলিকীকরণের ধারণা : রিটারের আঞ্চলিকীকরণের ধারণাটি নিম্নরূপ ঃ

(a) ক্ষুদ্র থেকে ক্রমশ বৃহত্তর আঞ্চলিক এককের মধ্যে মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে একটি আঞ্চলিক সংশ্লেষ (Regional synthesis) গঠিত হয়।

(b) এই প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক এলাকার সম্পর্ক নেই।

(c) কেবল পর্বতশ্রেণী বা নদী দ্বারা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার শনাক্তকরণ বা বিভক্তিকরণের জন্য প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের বণ্টনের (ভূপ্রকৃতি, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জলবায়ু ইত্যাদি) উপর তিনি গুরুত্ব দেন।

(iv) ভৌগোলিক বিষয়সমূহের মধ্যে সম্পর্ক এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interconnectedness and interrelationship among geographical phenomena) : প্রাকৃতিক এবং মানবিক বিষয়সমূহ একটি আঞ্চলিক সীমারেখার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং অন্তর্সম্পর্কের দ্বারা ওই এলাকাটির সামগ্রিক সত্তাকে উপস্থাপিত করে। এই জৈব এবং অজৈব বিষয়সমূহের অন্তর্সম্পর্ক স্থাপনকে তিনি আঞ্চলিক সংঘবদ্ধতা বা টেরেস্ট্রিয়াল ইউনিট (Terrestrial units) আখ্যা দেন। রিটারই প্রথম ভৌগোলিক যিনি এই ভৌগোলিক বিষয়সমূহের মধ্যে সম্পর্ক এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনা এবং তাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ভৌগোলিক পঠনপাঠনের প্রচলন করেন। রিটার, তাঁর লেখা "Die-Erd kunde" বইটিতে মানুষের ইতিহাস এবং প্রকৃতির আন্তসম্পর্ককে তুলে ধরেন।

রিটারের মতে ভূগোলের মূল উদ্দেশ্য হল "সমস্ত রকম প্রাকৃতিক বিষয়ের সঙ্গে মানুষের বা মানব সভ্যতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা, ওই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের একটি অংশের (অঞ্চলের) মানুষ-জমির স্বতন্ত্র্য সম্পর্কের নিরিখে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তুলনা করা।

Ritter claimed that the Central principle of geography is "the relation of all phenomena and forms of nature to human race, examined and organised within the framework of the unique geographical association of land and man on the earth's surface"

—Rana, 2008

রিটার-পূর্ববর্তী সময়ে ভূগোলকে কেবল প্রাণহীন তথ্যের সমন্বয় মনে করা হত। দেশের নাম, রাজধানীর নাম, নদী, হ্রদ, পর্বতের নাম মুখস্থ করাই ছিল তখন ভূগোলের পঠনপাঠনের পদ্ধতি। সেই চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করে রিটার ভৌগোলিক বিষয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি প্রচলন করেন।

(v) নিয়ন্ত্রণবাদ এবং সম্ভাবনাবাদের সার্থক সমন্বয় (A real combination of both determinism and possiblism) : অনেক ভৌগোলিক মনে করেন কার্ল রিটার একজন **নিয়ন্ত্রণবাদী** ভৌগোলিক। তাঁর লেখায় তিনি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে **নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে** দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কিন্তু রিটার প্রকৃতপক্ষে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন যেখানে প্রকৃতির দ্বারা মানুষ এবং অপরদিকে মানুষের দ্বারা প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হয়।

টাথাম (Tatham, 1967)-এর মতে, রিটার মনে করতেন মানুষ এবং প্রকৃতি একে অপরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করা যায় না সেজন্য ইতিহাসের (মানব সভ্যতার) থেকে

Scanned with CamScanner

ভূগোলকে (প্রকৃতি) পৃথক করা যায় না। প্রকৃতি মানুষকে যেমন প্রভাবিত করে মানুষও তেমন প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে।

Ritter's man-oriented geography clearly states : "The earth and its inhabitants stand in the closest reciprocal relation and one cannot be truly presented in all its relationships without the other. History and Geography must always remain inseperable. Land effects the inhabitants and inhabitants the land."

— Tatham, 1967

এই উক্তিকে উদ্ধৃত করে অধিকারী (Adhikari, 2010) মনে করেন রিটারকে নিয়ন্ত্রণবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয় যদিও অতীতে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার তা করেছেন।

"It would be wrong to describe Ritter as a determinist as some commentators have in the past."

— Adhikari, 2010

(vi) একটি এলাকা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক (A region as a complete unit) : রিটার একটি মহাদেশকে পরিপূর্ণ একক (organ) হিসেবে গণ্য করেন। এই মহাদেশকে যখন আরও ছোটো ছোটো অঞ্চলে ভাগ করেন তখন প্রতিটি অঞ্চলকে সমগ্র মহাদেশের খণ্ড (part) হিসেবে না দেখে এক-একটি স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ **আঞ্চলিক একক** বা সদস্য একক (member unit) হিসেবে গণ্য করতেন। এই সদস্য এককগুলি একত্রে সমন্বিত হয়ে বৃহত্তর মহাদেশটি গঠন করেছে। এই সদস্য এককগুলি নিজের মধ্যেকার প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়সমূহের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

(vii) ঈশ্বরবাদ (Teleology) : পৃথিবী তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে স্বাতন্ত্র্য— তার ব্যাখ্যা, অনন্য এই পৃথিবীতে বসবাসকারী স্বতন্ত্র প্রাণী হিসেবে মানুষ— এর ব্যাখ্যা এবং মহাদেশ-মহাসাগর প্রভৃতির বিস্তৃতি ও বণ্টন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ঐশ্বরিক ধারণার আশ্রয় নেন। তাঁর মতে, ঈশ্বরই এই জগতের সৃষ্টি কর্তা, যে প্রণালীবদ্ধ নিয়মে জগৎ চলছে তাও ঈশ্বরের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় যেসব প্রশ্নের সঠিক বিশ্লেষণ মেলে না রিটার তাদের ঐশ্বরিক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। ভৌগোলিক সামগ্রিক একক হিসেবে পৃথিবী বা মহাদেশগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ঐশ্বরিকতাবাদের অবতারণা করেন।

(viii) অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) : রিটারের মতে, ভূগোল হল একপ্রকার অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান। কোনো প্রতিষ্ঠিত বা আনুমানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে ও তার বিশ্লেষণের দ্বারা ক্রমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

(ix) দি আর্ডকুন্ডে (Die Erdkunde) : 1817 সালে রিটার তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করেন যার মূল বিষয় ছিল আফ্রিকার বিশদ বিবরণ। 1818 সালে এশিয়ার ওপরে তাঁর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই দুটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরে ভৌগোলিক জগতে সাড়া পড়ে গেল এবং এই লেখার দ্বারা ভূগোলের প্রকৃত সংস্কার শুরু হল। ভূগোল শাস্ত্র কেবল একটি বর্ণনার নথি না হয়ে একটি তুলনামূলক বিজ্ঞানে পরিণত হবে—এটাই রিটারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 1832-1838 সালের মধ্যে এই বইয়ের অপর ছয়টি খণ্ড এবং 1838 থেকে 1859 সালের মধ্যে অপর এগারোটি খণ্ড প্রকাশিত হয়।

সংক্ষেপে ভূগোলে রিটারের অবদান

- ভূগোলের পঠন পাঠনকে মানুষ কেন্দ্রিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা।
- অঞ্চলের ক্রমবিন্যাস। বড়-ছোটো সব অঞ্চলে জৈব অজৈব উপাদানের সমন্বয়ে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা।
- কোন এলাকার বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় সমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবনকেই ভূগোলের মূল পাঠ্য হিসাবে উপস্থাপন করা।
- নিয়ন্ত্রনবাদ ও সম্ভাবনাবাদের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন।
- ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় ঐশ্বরিক মতবাদের প্রচলন।
- অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সংশ্লেষের মাধ্যমে ভূগোলকে অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা।
- আর্ডকুন্ডে বইটি অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সার্থক এবং ভৌগোলিক বিষয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়ের সার্থক উদাহরণ।

Scanned with CamScanner